স্যমবেন উসমান : আফ্রিকী সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ

এলহাম হোসেন

সাহিত্য কল্পকাহিনী নয়। এতে কল্পনা থাকে, কল্পনার শরীর থাকে। কিন্তু এর অস্থিমজ্জায় থাকে লেখকের জীবন-ঘনিষ্ঠতা, বাস্তবতা-সংশ্লিষ্টতা। আফ্রিকী কথাসাহিত্যের শরীর জুড়ে কল্পনার রঙ থাকলেও ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনের অভিঘাতে এর অস্থিমজ্জা হয়ে ওঠে জীবন-ঘনিষ্ঠ, ইতিহাসের সত্যে সমৃদ্ধ; এটি রাজনীতি ও সমাজ-সচেতনতার শোণিতে বলকায়। এমনই জীবন-ঘনিষ্ঠ ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন এক মহান সাহিত্যস্রষ্টা, যাকে সেনেগাল তথা আফ্রিকার চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়, যার স্পর্শে উত্তর-ঔপনিবেশিক সেনেগালের সাহিত্য হয়ে ওঠে পুরো আফ্রিকার কণ্ঠস্বর, তিনি হলেন স্যমবেন উসমান। তাঁর কণ্ঠ অত্যন্ত জীবন-ঘনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও দূর্লভ সাহসী। জীবনের নানান অভিঘাত তাঁকে স্বশিক্ষিত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কখনও কাজ করেছেন রাজমিস্ত্রীর, কখনও হয়েছেন সূত্রধর, কখনও ধীবর, আবার কখনও মেকানিক, কখনওবা জাহাজ ঘাটের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীতে গোলাবর্ষনকারী হিসেবেও কাজ করেছেন। বিচিত্র পেশার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা তাঁকে লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সাবালক করে তুলেছে, আর নন্দনভাবনাকে করেছে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনায় শানানো। বিশ্ব-নাগরিক হয়ে উঠেছেন, কিন্তু বিশ্বায়নের অন্তরালে পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থ হাসিলের তৎপরতার তিনি তীব্র সমালোচকও বটে।

সেনেগালের প্রধান ভাষা ওলোফ। শতকরা আশি ভাগ লোক এই ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু স্যমবেন উসমান লেখেন ফরাসি ভাষায়। এটি প্রাক্তন ঔপনিবেশিকদের কাছ থেকে সেনেগালীয়রা উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে। এটি সেনেগালের দাপ্তরিক ভাষা। শতকরা ১৫ থেকে ২০ জন মানুষ এই ভাষা বোঝে। এই দুয়ের প্রাণবন্ত মিশ্রণও ঘটিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে। জন্মেছিলেন ঔপনিবেশিক সেনেগালে ১৯২৩ সালে। মৃত্যুবরণ করেন ২০০৭ সালে, স্বাধীন সেনেগালে। কিন্তু ইতিহাসের নানা বাঁক পেরিয়ে উসমান লেখক-চলচ্চিত্রকার হিসেবে যেখানে এসে দাঁড়ান, সেখানে তাঁকে ভূমিকা নিতে হয় একজন কঠোর সমালোচকের এবং স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতাত্তোর প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধের। সমাজের যে স্তর থেকে তিনি লেখক হয়ে উঠেছেন তা তাঁকে করে তুলেছে আপোসহীন ও অকুতোভয়। অন্যায়, শোষণ, অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবৈষম্য, শাসকশ্রেণির বৈপরীত্যে ভরা চরিত্র, মুখ ও মুখোশের ব্যবধান, প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভুদের স্বার্থরক্ষার পাহারাদার হিসেবে স্বাধীনতাত্তোর নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ও সাম্প্রদায়িক চেতনা তাঁকে ক্ষীপ্ত করেছে, ব্যথিত করেছে। ইউরোপীয়দের চলচ্চিত্রে আফ্রিকার অমর্যাদাকর উপস্থাপনাও তাঁকে স্পষ্টবক্তা হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, বাধ্য করেছে। উপন্যাস লিখেছেন, আবার এর কোন কোনটির চলচ্চিত্ররূপও দিয়েছেন। যারা লিখতে-পড়তে জানে তাদেরকে তাঁর নিজের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন গল্প-উপন্যাসের ছাপা অক্ষরে। যারা লিখতে-পড়তে জানে না তাদের কাছেও পৌঁছেছেন চলচ্চিত্র নিয়ে। তাঁকে তো বলতে হবে যে, তাঁরা সমাজের কোথায় অবস্থান করছেন। কেন্দ্রে নাকি প্রান্তে? এর জন্য কি অদৃশ্য নিয়তিকে দোষারোপ করা হবে, নাকি নিয়তি হয়ে যে শোষকের দল তাদের কাঁধে

চেপে বসে আছে, তাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে? এই উপলব্ধিই উসমানকে একজন চলচ্চিত্রকার হয়ে উঠতে প্রণোদিত করে।

উসমান স্বশিক্ষিত ও স্বপ্রণোদিত লেখক-চলচ্চিত্রকার। সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাই তাঁকে লেখক-চলচ্চিত্রকার হয়ে ওঠার রসদের যোগান দেয়। কিছু সময় রাশিয়াতে কাটিয়েছেন চলচ্চিত্র নিয়ে লেখা-পড়ার জন্য। ১৯৬০-এর দশকে শুরু করেন দ্বৈত ভূমিকা-লেখক আর চলচ্চিত্রকার হিসেবে। সে-থেকে নয়টি ফিচার ফিল্ম ও চারটি শট ফিল্ম নির্মাণ করেছেন। আর লিখেছেন দশটি উপন্যাস। চারটি ডকুমেন্টারি। সবই ফরাসি ভাষায়। তাঁর কয়েকটি বইয়ের নিজেই চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছেন। আবার দুটি চলচ্চিত্রের উপন্যাসরূপও দিয়েছেন তিনি। তাঁর লেখনি ও চলচ্চিত্র – উভয় মাধ্যমই পাঠক-দর্শকের নাকে সত্য-ভাষণের ঝাঁঝালো স্বাদের অনুভূতি জাগায়। তাঁর সৃষ্টিকর্ম আধিপত্যবাদ বিরোধী বজ্রকণ্ঠে রূপ নেয়। এর কারণ, উসমানের ওপর বাম রাজনীতির প্রভাব, ফরাসি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা, ভিয়েতনাম যুদ্ধে ফ্রান্সের অস্ত্রশস্ত্র যোগান দেয়ার বিরোধিতা, হারলেম রেনেসার প্রভাব এবং হাইতির মার্কসবাদী লেখক জ্যাক রুমেনের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর এই প্রতিবাদী স্বভাব শৈশবেই সবার দৃষ্টিগোচর হয়। একবার স্কুল-সুপার চাইলেন, সবাই ঔপনিবেশিকদের ভাষায় গান গাইবে। কিন্তু বালক স্যমবেন ঔপনিবেশিকদের ভাষায় গাইবেন না। পরিণতি হলো স্কুল থেকে বহিস্কার। সবাই ধরে নিয়েছিলেন, স্যমবেনের বাবা মুসা স্যমবেন রাগ করবেন ছেলের ওপর। কিন্তু তিনি তা করলেন না, বরং বললেন, স্কুলের বাইরে থেকেও তো অ-নে-ক কিছু শেখার আছে। এরপর থেকে ছেলেকে সাথে নিয়ে মাছ ধরতে যান প্রতিদিন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বন্ধ হলো। কিন্তু তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মানুষ ও বাস্তবতা দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁকে শেখানোর। স্যমবেন চারপাশটা দেখে ক্ষেপে যান। প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। এক সাক্ষাতকারে স্যমবেন জানিয়েছেন, এই সময়ই নাকি তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে পাইপ টানাও শিখে ফেলেন।

স্যমবেনের উপন্যাসগুলোর শিরা-উপশিরায় প্রতিবাদ ও কঠোর সমালোচনার উষ্ণ শোণিত সবসময় বলকায়। তার প্রথম উপন্যাস *ব্ল্যাক ডকার* (১৯৫৬) একটি অত্যন্ত সাহসী সামাজিক-রাজনৈতিক বয়ান। ছাপা হয় ঔপনিবেশিক সেনেগালে। চতুর ঔপনিবেশিকরা, যারা প্রতিনিয়ত জেনোফোবিয়ায় ভোগে, তারা কীভাবে স্থানীয়দের চিন্তা-চেতনাকে চুরি করে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখার অপচেষ্টা চালায়, তারই সাহসী উচ্চারণ হলো এই ছোট্ট উপন্যাস। দিয়ো ফালা, যে ফ্রান্সের এক জাহাজ ঘাটের শ্রমিক, সে একটি উপন্যাস লিখে ফেলেন। এটি ছাপানোর জন্য প্রকাশক খোঁজার এক পর্যায়ে এক ফরাসি লেখিকার সান্নিধ্যে আসে। লেখিকা তার লেখা ছাপানোর আগ্রহ দেখিয়ে পাণ্ডুলিপিটি তার কাছ থেকে নিয়ে আসে। কিন্তু পরে সে তার নিজের নামেই উপন্যাসটি ছাপিয়ে দেয়। কাহিনীর শেষের দিকে দিয়ো ফালা এই লেখিকাকে হত্যা করে জেলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত বিচারে তার ফাঁসি হয়। উপন্যাসটি খুব বেশি সফল না হলেও স্যমবেনের লেখকবৃত্তি চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থের সমাগম ঘটিয়েছিল।

স্যমবেন বরাবরই বিশ্বাস করেন, একটা জাতির পরিচয়ের বয়ান তৈরী হয় তার নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়ে। এটি হারিয়ে গেলে জাতির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষাও হারিয়ে যায়। এজন্য ঔপনিবেশিকদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যই হলো এই উপষঙ্গগুলো ধ্বংস করা। এগুলোকে হটিয়ে দিয়ে তাদের সাথে করে নিয়ে আসা বয়ান স্থানীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া। মার্কসবাদী স্যমবেনের এটি বুঝতে অসুবিধে হয় নি। ফলে, তাঁর উপন্যাস, গল্প ও চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে দেশীয় সংস্কৃতি, শিল্প, চেতনা ও বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রতিফলন। পল্লীসাহিত্যের অজস্র উপকরণ তাঁর চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। *খালা* চলচ্চিত্রে হাজি আব্দু কাদের বেয়ীর যৌন অক্ষমতা, যাকে স্থানীয় ভাষায় 'খালা' বলা হয়েছে, তার ধারণা সেনেগালের লোকজ সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে। ওঝা, কবিরাজ, বিকলাঙ্গ মানুষের উপস্থিতি সেনেগালের লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ। তাঁর *Borom Sarret* চলচ্চিত্রেও স্যমবেন বিকলাংগ মানুষের অবতারণা করেছেন। তবে যেখানে স্যমবেন স্থানীয়ের দেয়াল ভেঙ্গে সর্বজনীনতায় পৌঁছেছেন, সেটা হলো এই বিকলাঙ্গ শরীরগুলো শুধু সেনেগাল নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্বাধীনতাত্তোর শাসক-বুর্জ্জোয়াদের কপটতা, দূর্নীতি ও প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভুদের পদলেহী মানসিকতার বিকারগ্রস্ততার রূপকালঙ্কারিক চিত্রই অংকন করেছেন।

স্যমবেন উসমান আশাবাদী লেখক ছিলেন। তবে অন্যান্য অনেক আশাবাদী লেখকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটা নিহিত তাঁর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি সেনেগালের স্বাধীনতার পূর্বে আরও দুটি উপন্যাস ছাপেন। *ও দিস ল্যান্ড* এবং *মাই বিউটিফুল পিপল* ছাপা হয় ১৯৫৭ সালে। আর *গড্‌স বিট্‌স অব উড* ছাপা হয় ১৯৬০ সালে। উভয় উপন্যাসেই উসমানের মাতৃভূমির স্বাধীনতার ব্যাপারে ভবিষ্যত দ্রষ্টাসুলভ দার্শনিকতাপূর্ণ আশাবাদ প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু স্যমবেন খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেই যে দেশের সমাজ, অর্থনীতি, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির চিরায়ত রূপে প্রত্যাবর্তন ঘটবে– তা নয়। বাহ্যিক একটা পরিবর্তন হবে, যাকে কসমেটিক পরিবর্তনও বলা হয়, কিন্তু অস্থিমজ্জায় ঔপনিবেশিক প্রভুদের ব্যবস্থাই টিকে থাকবে। ফলে, সাদা অভিজাতের জায়গা দখল করবে স্থানীয় কালো অভিজাতগণ। জেনোফোবিয়া পরিণত হবে আন্ত:শ্রেণিবৈষম্যে। দেশের অভ্যন্তরীণ পুঁজিওয়ালারা রাষ্ট্রের কলকাঠি নাড়বে আর রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করবে নিজ দেশের লোকদেরই কণ্ঠরোধ করার কাজে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সাম্য অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হলো রাষ্ট্রকে শুরুতেই রাজনৈতিক ও ভৌগলিক দিক থেকে স্বাধীন হতে হবে। তবে স্যমবেন মনে করেন, কেবলমাত্র এরূপ স্বাধীনতাই এই সাম্য নিশ্চিত করতে পারে না। এই সাম্য তৈরির প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা-অর্জন অনেকগুলোর মধ্যে একটি উপষঙ্গ মাত্র। এই ধারণা তাকে নেগ্রিচুড আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব স্যাঁগর থেকে আলাদা করেছে। স্যাঁগর স্বাধীনতা অর্জনকে আফ্রিকার আফ্রিকত্ব অর্জনের প্রধানতম কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ স্যমবেন মনে করেন, শুধু বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত ভেতরের ছিদ্রকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ারও একটি বড় কারণ বটে। আর এই ছিদ্রপথে অনিষ্ট প্রবেশ করবেই। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ অভিজাততন্ত্র, শ্রেণিভেদ প্রথা, ধনিক শ্রেণির তীব্র স্বাতন্ত্রবোধ, স্থানীয়দের দ্বৈত সচেতনতা বা 'ডবল কনশাসনেস' ইত্যাদি আত্মপরিচয়

প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করতে পারে। অনেকাংশেই এগুলো ঔপনিবেশিক তৎপরতার চেয়েও শক্তিশালী রূপ ধারণ করে ও তার চেয়েও বেশি অনিষ্ট সাধন করে থাকে।

এই উপলব্ধি স্যমবেনকে তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্বকারীর মর্যাদা দান করেছে। আমেরিকার মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ফ্রেডেরিক জেমসনের মতে, একজন তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবী সবসময়ই রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং তাঁর কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত হয় সাধারণ জনতার অভিজ্ঞতার দ্বারাই। কারণটাও স্পষ্ট। সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী তো কায়েমী স্বার্থবাদীদের শান্তিতে ঘুমাতে দেবেন না। তাঁর কাজ এদেরকে জাগিয়ে রাখা ও এদের কানে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়া ও এদের হস্তিদন্ত নির্মিত প্রাসাদের ভীত কাঁপিয়ে দেওয়া। স্যমবেন তাঁর লেখা ও চলচ্চিত্র– উভয় মাধ্যমেই এই সাহসী কাজটি করেন। এই সাহস ও দায়িত্ববোধ স্যমবেন পেয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। কোন প্রলোভনের কাছে মাথা নত না করার সাহস পেয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকেই। তাঁর নিজের জবানিতে:

> আমার বাবা বরাবরই কারও চাকুরি করতে অনীহ ছিলেন। তিনি আমাকে বলতেন যে, তিনি কখনই সাদা চামড়ার মানুষদের কর্মচারী হতে চান না। তিনি স্বাধীন জীবন উপভোগ ও পরিবারের ভরণ-পোষনের জন্য মাছ ধরার কাজ করে গেছেন। (গাদজিগো, ১৩)

খালা উপন্যাসেও স্যমবেনের এই দুর্দমনীয় প্রতিবাদ-স্পৃহা প্রকাশ পেয়েছে। এটির চলচ্চিত্ররূপ দেন ১৯৭৫ সালে। উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে সেনেগালের স্থানীয় অভিজাতদের অর্থনৈতিক অক্ষমতার বিষয়কেই তীব্রভাবে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ করা হয়েছে এতে। হাজি আব্দু কাদের বেয়ীর ধনী হওয়ার ইতিহাস স্বাধীনতাত্তোর সেনেগালের নেতৃত্বের ব্যর্থতার ইতিহাসেরই প্রতিচ্ছবি। নিজের জাতি-ভাইদের প্রতারিত করে, অসৎ পন্থায় বেয়ী সমাজের অভিজাতদের কাতারে উঠে এসেছে। চেম্বারস এন্ড কমার্সের সে নেতা। তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার আনুষ্ঠানিকতার টাকা-পয়সাও আসে অবৈধ পন্থায়। বিদেশি জলের বোতল থেকে সে জলপান করে। এই জল তাঁর মার্সিডিসের কার্বুরেটরেও ঢেলে দেওয়া হয়। তার বাড়ির সামনে জটলা পাকিয়ে থাকা ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দেয়। তবে নিজের হাত দিয়ে নয়। ছুড়ে মারে কিছু মুদ্রা ওদের দিকে। হুড়োহুড়ি করে ওরা মুদ্রাগুলো কুড়িয়ে নেয়। হাজি এই দৃশ্য উপভোগ করে। বিত্ত-বৈভবের চরম বৈপরীত্য পাঠকের চোখে পড়ে। কিন্তু হাজি তৃতীয় বিয়ের রাতেই পুরুষত্ব হারিয়েছে। অভিশাপে। কার অভিশাপ? কেন এই অভিশাপ? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণেই উপন্যাসের কাহিনী প্রবাহিত হয়। এই অভিশাপ স্খলনের তৎপরতায় হাজি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, একদল ভিক্ষুক হাজির হৃত পুরুষত্ব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশে চিকিৎসা করছে। কী অদ্ভুত সে চিকিৎসা-পদ্ধতি! উলঙ্গ হাজির গোটা শরীর ভিক্ষুকদের থুথুতে সিক্ত হয়ে উঠছে। আর থুথু নিক্ষেপের ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে বুর্জোয়াদের শোষণ-বঞ্চনায় ভিক্ষুকে পরিণত হওয়া সমাজের প্রান্তিক মানুষদের তীব্র ঘৃণা, রাগ আর ক্ষোভ। আসলে, এই উপন্যাসে স্যমবেন উসমান স্বাধীনতাত্তোর সেনেগালের নেতৃবৃন্দের চরম ব্যর্থতা, দুর্নীতি, শোষণ ও নিপীড়ণের চিত্র তুলে ধরেছেন।

স্যমবেন বিশ্বাস করেন, আধুনিকায়ন কখনই অর্থবহ হয় না যদি চিন্তা, চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থানীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করা না যায়। ইতিহাস-ঐতিহ্যের মধ্যে একটি জাতির স্বতন্ত্র পরিচয় নিহিত থাকে। জাতির অভিজ্ঞতা, ভাবনা, বিশ্বাস-ব্যবস্থা, ধারণা ইত্যাদি ব্যক্তিস্বত্ত্বার শরীর ও আত্মা তৈরি করে। শুধু রোমাঞ্চিত হওয়ার জন্য ঔপনিবেশিকদের ধ্যান ধারণার আমদানি এবং তার দ্বারা নিজেদের অস্তিত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণে অব্যাহত চেষ্টা অবশ্যই শীঘ্রই ব্যর্থ হয় এবং সামগ্রীকভাবে জাতি হতাশ হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে ঔপনিবেশিকদের ন্যারেটিভ বা বয়ানের ব্যাপারে সন্দিহান করে তুলেছে। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে দেশের সার্বিক চিত্রায়নের মধ্যে এক তিক্ত শ্লেষ ও আক্রমণের তীব্রতা অনুভূত হয়। কারণও সুস্পষ্ট। সেনেগালের স্বাধীনতা খুব দ্রুতই স্থানীয় বুর্জোয়া ও প্রভুত্ববাদী নেতাদের হাতে এসে এক দোর্দন্ড 'হেজেমনি' বা আধিপত্যবাদে পরিণত হয় কারণ, এরা প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভুদের ধ্বজাধারী হিসেবে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র *মানি অর্ডার* এ দেখানো হয়েছে কীভাবে গ্রামের নগরায়ণ হচ্ছে শহুরে পুঁজিবাদীদের হাতে। গ্রামের নগরায়ন পুঁজিবাদীদের বিনিয়োগের লাভজনক ক্ষেত্র। আর পুঁজিবাদী বলেই তাদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে প্রাক্তন ঔপনিবেশিকদের। এ কারণে প্রাক্তন ঔপনিবেশিকদের ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী সেনেগালের নগরায়ণ উসমানকে খুশি করতে পারেনি। তাই স্যমবেনের সাহিত্যকর্ম স্বাধীনতাত্তোর প্রজন্মের লেখকদের সামনে পেসিমিসটিক উপন্যাস বা হতাশাবাদী উপন্যাসের ধারার সূচনা করেছে। আবার স্যমবেন গবেষণাধর্মী বা নিরীক্ষাধর্মী লেখকও বটে। তাই ইতিহাসের পাঠ তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। তাঁর সমাজ-ভাবনা যথার্থই বাস্তবতা-ঘনিষ্ঠ। তিনি তাঁর উপন্যাস ও সিনেমায় দেখিয়েছেন কীভাবে বি-ঔপনিবেশিকরণের পরেই দেশ ও এর স্বাধীনতা স্থানীয় বুর্জোয়া ও আধিপত্যবাদীদের হাতে এসে পড়েছে। এরা ঔপনিবেশিকদের মতো অন্যের দেশ দখল করতে যায় না বটে, কিন্তু নিজের জাত-ভাইয়ের ভূমি, বিশ্বাস ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ওপর ঠিকই চড়াও হয়। সাম্প্রদায়িকতার গরলে ফুলে-ফেঁপে উঠে ফণা তোলে তাদেরই স্বদেশীদের বিরুদ্ধে। এটিকে ডমেসটিক কলোনিয়ালিজম বললেও অত্যুক্তি হবে না।

স্বাধীনতাত্তোর সেনেগালে স্থানীয় শাসকদের কপট ভূমিকা নিয়ে স্যমবেন খুব জোরালো ও সাহসী প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর ছোট দুটি উপন্যাস *মানি অর্ডার* ও *হোয়াইট জেনেসিস-এ*। স্থানীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে শ্বাসরোধ করে গ্রামের নগরায়ণের যে প্রক্রিয়া চালানো হয় উন্নয়নের দোহাই দিয়ে, তার পশ্চাতে কলকাঠি নাড়ে স্থানীয় পুঁজিওয়ালারা যারা ঔপনিবেশিক প্রভূদের স্বার্থের পাহারাদার হিসেবেই কাজ করে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে তখন সম্পর্কের মানদণ্ড হিসেবে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিশ্বাস-ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র আর মুখ্য হয়ে ওঠে না। তখন এই দুই বাইনারী অপজিশনের সম্পর্কের প্রধান উপষঙ্গ হিসেবে সামনে আসে 'মানি' বা টাকা। ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ব্যক্তি এবং জাতির শিকড়। বিশ্বায়ন, উন্নয়ন, প্রাগ্রসরতা ইত্যাদি নানান কথার ফুলঝুড়ি ছুটিয়ে তখন শুধু একটি শক্তিই মূর্ত হয়ে ওঠে, আর তা হলো 'টাকা'। পুঁজিওয়ালাদের গন্তব্যও তো এই টাকাই। এটিই তাদেও হেজেমনির অন্যতম প্রধান উপষঙ্গ।

তাই *হোয়াইট জেনেসিস*-এ স্যমবেন উসমান স্বাধীনতাত্তোর সেনেগালের লেখকদের দায়িত্ব কী হওয়া উচিত, তা জোরালোভাবেই নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক গল্পকথকের ভূমিকা হবে সত্য, ন্যায়বিচার ও সাম্যের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠা। কথককে কখনই অসত্য ও কপটতার প্রশ্রয় নেয়া চলবে না। এই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতাত্তোর প্রজন্মের কিছু লেখক স্যমবেন উসমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে আসছেও। ইয়ামবো ওলুগুয়েম এর *বাউন্ড টু ভায়োলেন্স* এবং আহমাদু কওরুমার *দ্যা সানস অব ইনডিপেন্ডেন্স* স্যমবেন উসমানের প্রবর্তিত সাহিত্য ধারারই সৃষ্টি। এই উপন্যাসগুলো নিরীক্ষাধর্মী। তবে স্যমবেন ফরাসি ভাষা ব্যবহারে যেখানে পৌঁছেছেন, এদের সেখানে পৌঁছতে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

স্যমবেন গভীর নিরীক্ষাধর্মী লেখক। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে চষে বেড়িয়েছেন সেনেগালের শহর, নগর, গ্রামে। বিপুল নিরক্ষরতার প্রকৃত অবস্থা দেখে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর ছাপার অক্ষরে গল্প-উপন্যাস এদেও কাছে হয়ত কখনও পৌঁছবে না। যারা পড়তেই পারে না, তাদের কাছে তিনি তাঁর বক্তব্য নিয়ে হাজির হবে কীভাবে? এই উপলব্ধিই তাঁকে চলচ্চিত্রকার হয়ে উঠতে প্রণোদনা দিয়েছে। লেখক থেকে চলচ্চিত্রকার হয়ে ওঠার পেছনে এটাও একটা কারণ। যারা লিখতে পড়তে জানে তাদের কাছে তাঁর উপন্যাস পৌঁছবে। কিন্তু তিনি তাঁর কথা তাদের কাছেও পৌঁছে দিতে চান, যারা লিখতে-পড়তে জানে না। তিনি কৃষক, শ্রমিক সবাইকে শরীক করতে চান তার সত্য ভাষণের মিছিলে। তিনি বিশ্বাস করেন, একজন গল্পকথক গল্প বোনেন শব্দ দিয়ে, কথা দিয়ে, গল্প কথনের ঢং দিয়ে। কিন্তু চলচ্চিত্রকার গল্প বলেন সঙ্গীত, শব্দ, ভঙ্গি, গল্প ও নারী-পুরুষের সমন্বয় ঘটিয়ে রূপালী পর্দায়। যেখানে প্রথমে চোখ আর পরে মন আপ্লুত হয়। দর্শক নিজেকে মেলান অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে। আর এভাবে তাঁর সংযোগ ঘটে চলচ্চিত্রকারের বক্তব্যের সঙ্গে। স্যমবেন এ কারণেই বেছে নেন চলচ্চিত্র মাধ্যমকে। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মনোযোগ দেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। এই সময়ে পাঁচটি সিনেমা নির্মাণ করেন। *দ্য মানি অর্ডার*, *তাউ*, *ব্ল্যাকগার্ল*, *এমিতাই* এবং *খালা*। এগুলোর মধ্যে *খালা* উপন্যাস আকারে ছাপা হয় ১৯৭৩ সালে।

স্যমবেনের চলচ্চিত্রে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০-এর শুরুর দিকে সেনেগালের স্থানীয় ভাষা 'ওলোফ' প্রচারের ব্যাপারে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ওলোফ ভাষায় সংবাদ পত্রিকা *কাদ্দু*-র প্রকাশনা শুরু করেন তিনিই। এর একটা ইস্যুতে *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর* নিজের করা ওলোফ ভাষায় তর্জমাও প্রকাশ করেন। ভাষার দ্বারা ঔপনিবেশিকরণের ঘটনা অত্যন্ত স্পষ্ট। শুধু ঔপনিবেশিক কালেই নয়, বিশ্বায়নের যুগেও। এক্ষেত্রে কেনীয় লেখক নগুগি ওয়াথিয়োঙ্গ'র কথা স্মার্তব্য। তাঁর মতে, যখন কেউ ঔপনিবেশিকদের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তখন সে তাদের আধিপত্যকেও মেনে নেয় এবং নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রান্তের দিকে ঠেলে দেয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক কালেও এ কারণে নয়া-ঔপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। স্যমবেন এ-বিষয়টি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন। তাঁর *খালা*-তে স্যমবেন রমাকে দাঁড় করিয়েছেন স্থানীয় ভাষা-সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসেবে। হাজি ঔপনিবেশিকদের ভাষা ফরাসিতে প্রশ্ন করলেও রমা উত্তর দেয় ওলোফ ভাষায়। রমা মাতৃভাষা

আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। আসলে বিশ্বায়নের নামে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করার ঘোর বিরোধী স্যমবেন। তাঁর এই অবস্থান *দ্য লাস্ট অব দ্য এম্পায়ার* চলচ্চিত্রেও পাওয়া যায়।

স্যমবেনের কতিপয় চলচ্চিত্রের উপন্যাস রূপ থাকলেও দুয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্যও বিদ্যমান। তাঁর উপন্যাস বাস্তবধর্মী। এর প্রতিটি শব্দে সেনেগালের ইতিহাস, রাজনীতি ও ঐতিহ্যের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তাঁর চলচ্চিত্র উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিকী ও চিন্তাকর্ষক। অদ্ভুত কিন্তু আকর্ষণীয় দৃশ্যায়নের মধ্য দিয়ে তিনি হাজির করেন অনেক বড় বড় বয়ান বা ন্যারেটিভ। চলচ্চিত্র মূলত একটি পশ্চিমা মাধ্যম। কিন্তু স্যমবেন এই পশ্চিমা মাধ্যমকে পুরোপুরিভাবে আফ্রিকী সংস্কৃতি, মানুষের প্রয়োজন ও দাবী অনুযায়ী স্থানীয় নন্দনতত্ত্বের সাথে ছান্দসিক করে তুলেছেন এবং একই সাথে বিনোদন ও সমাজ বিনির্মানের হাতিয়ারে পরিনত করেছেন। এক সাক্ষাতকারে স্যমবেন বলেছিলেন:

> যা আমাকে আগ্রহী করে তোলে তা হলো আমার মানুষরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়, তা তুলে ধরা। আমি মনে করি, চলচ্চিত্র একটি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যম। তথাপি, আমি 'পোস্টার ফিল্ম' বানাতে চাই না। বিপ্লবী চলচ্চিত্র ভিন্ন জিনিস। অধিকন্তু, আমি এতটা নাদান নই; আমাদের একদল লোকও যদি ঐ একই বিষয়ে চলচ্চিত্র বানায়, তবে আমরা বাস্তবতার সামান্য পরিবর্তন করতে পারব।

স্যমবেন বিশ্বাস করেন, একজন চলচ্চিত্রকার হলেন ইতিহাসবিদ, জাতির বিবেক। তিনি সমাজের মধ্যে বাস করেন এবং তাঁর চারপাশের যা কিছু অন্যায় তার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তোলেন। তিনি আইভরি টাওয়ারে আত্মমগ্ন হয়ে থাকেন না, থাকেন রক্ত-মাংসের সান্নিধ্যে। তাই মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। দায়বদ্ধতার এই জায়গা থেকেই তিনি *ব্ল্যাকগার্ল* চলচ্চিত্রে কৃষ্ণকায়া দিওনার পরিনতির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিকদের শোষণ, বঞ্চনা, মিথ্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। বাচ্চাদের দেখাশুনা ও তাদের সাথে খেলাধুলা করার কথা বলে কাজে নিয়োগ দিয়ে তাকে দিয়ে করানো হয় ধোয়া-মোছা, রান্না-বান্নার কাজ। মসিয়ে ও ম্যাডামের এই প্রতারণা দিওনা মানতে পারে না। যে বাথটাব সে ধোওয়া-মোছার কাজ করতো তার মধ্যে শুয়েই সে নিজের গলায় ক্ষুর চালায়। আত্মহত্যা করে ক্ষোভে, অপমানে। গ্রামীন ও শহুরে জীবনের সম্পর্কের টানাপোড়েন, নারী-পুরুষের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি, পরকীয়া প্রেমের সমস্যা ইত্যাদি ঔপনিবেশিক আফ্রিকার আবহে ফুটে উঠেছে তাঁর *নিয়ায়ে* (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে। একজন তরুন বেকারের জীবন সংগ্রামের মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে *তাউ* (১৯৭০) তে। *মানদাবী* (১৯৬৮) তে সদ্য স্বাধীন সেনেগালের উন্নয়নের পথে নানান প্রতিকূলতার চিত্র অংকিত হয়েছে। একজন অশিক্ষিত মধ্যবয়সী মানুষ আমলাতন্ত্রের তীব্র কষাঘাতে কীভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে- সে-চিত্র ধারন করা হয়েছে এতে। তাঁর ১৯৯২ সালের চলচ্চিত্র *গেলোওয়ার* আরও সাহসী হয়ে উঠেছে স্বাধীন সেনেগালে সাহায্য-সহযোগিতার নামে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতারণা ও শোষণের সমালোচনায়। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার দৌরাত্মের তীব্র সমালোচনা করার ক্ষেত্রেও স্যমবেন অকুতোভয়। তিম্বাকতুর গুরুত্ব এবং ফরাসী ঔপনিবেশিকদের তৎপরতার বিরুদ্ধে সংরাই এর প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করে তাঁর নির্মিত প্রথম ছবি *লা এমপায়ার সংরাই* (১৯৬৩) আন্তর্জাতিকভাবে প্রদর্শিত হয় নি। হতে দেওয়া হয় নি।

তবে স্যমবেন উসমান দমে যাওয়ার পাত্রও নন। কারণ, তিনি চলচ্চিত্রকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখেন। আর এই হাতিয়ার যতবেশি মানুষকে এর সাথে যুক্ত করবে, ততোবেশি শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। তাই তাঁর চলচ্চিত্র দর্শক শুধু উপভোগ করে না, একে ধারণও করে। চলচ্চিত্রকার হিসেবে এখানেই তাঁর স্বার্থকতা। তিনি তাঁর দর্শকদের যুক্ত করে ফেলেন তাঁর চলচ্চিত্রের সাথে। তাঁর কণ্ঠ হয়ে ওঠে দর্শকের কণ্ঠ। তাঁরা নিজেদের অবস্থান বোঝে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নানান অসংগতির ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। তাঁর নির্মিত সব চলচ্চিত্র উপভোগ করেই দর্শক হয়ে ওঠে সজাগ, সচেতন ও উৎসুক। প্রশ্ন করেন স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, ধর্মের ভূমিকা, বিশ্বাস-ব্যবস্থাকে। দর্শক প্রশ্ন করেন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সেই সময়ের ভূমিকা নিয়ে, যে সময় সেনেগাল সহ আফ্রিকায় চলেছে দাস ব্যাবসায়। তারা আরও প্রশ্ন করে ঔপনিবেশিকদের নির্মম নিপীড়ন, লুণ্ঠন, স্থানীয়দের মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক টেক্সট তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার নির্লজ্জ কৌশল এবং স্বাধীনতাত্তোর স্থানীয় বুর্জোয়াদের কপট ভূমিকাকে।

আর একটি ব্যাপার স্যমবেনকে সত্যাদর্শী সমাজ সচেতন লেখক হিসেবে উপস্থাপন করেছে, আর তা হলো তাঁর লিঙ্গভেদহীন আফ্রিকী সমাজের ভবিষ্যত দর্শন। অক্ষম পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে জায়গা করে দিতেই হবে নারীকে। *খালা* উপন্যাসে হাজির যৌন অক্ষমতার মধ্য দিয়ে এই বার্তাই স্যমবেন পৌঁছে দেন পাঠকের কাছে। *খালা* চলচ্চিত্রে হাজির মেয়ে রমাকে একটা দৃশ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখানো হয়েছে যার পেছনে শোভা পাচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্র। এই প্রতীকী দৃশ্যও নারীর ভবিষ্যত ক্ষমতায়নের ব্যাপারে দর্শকদের ধারণা দেয়। ছোট উপন্যাস *তাউ* এবং গল্প 'দ্যা বিলাল'স ফোরথ ওয়াইফ' এবং 'হার থ্রি ডেইজ' এ বহু বিবাহের ভাঙন ও নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। *তাউ* এর ইয়াঈ দাবো এবং *গড্‌স বিট্‌স অব উড* এর পেনডা দেখিয়েছে যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানের বাইরে গিয়েও আফ্রিকী নারীরা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারে। এমনকি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবে নারীরা কোন অংশে পুরুষের চেয়ে কম নয়। *গডস বিটস অব উড* উপন্যাসটি প্রকাশ পায় সেনেগালের স্বাধীনতার বছর ১৯৬০ সালে। এর স্বাধীনতার পশ্চাতে নারীদের জোরালো ও কার্যকর ভূমিকাও এই উপন্যাসে রূপকার্থে অংকিত হয়েছে। *মুলাদি* চলচ্চিত্রে স্যমবেন অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সমালোচনা করেছেন নারীর খতনা-ব্যবস্থাকে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি নারীকেই প্রতিবাদীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে দিয়েছেন কথা আর শরীরে দিয়েছেন ভাষা। এই কথা নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান ঘোষণা করার; এই ভাষা প্রতিবাদের।

সকল আফ্রিকী শিল্পী-সাহিত্যিকের মতো স্যমবেনও বিশ্বাস করেন, শিল্পী কখনও সত্যকে আড়াল করে না। শিল্পী তো একজন আর্কিওলোজিস্টের মতই ইতিহাস-ঐতিহ্যের মাটি খুঁড়ে এর গভীরে লুকিয়ে থাকা জ্বলজ্বলে সত্যকে পাঠক-দর্শকের সামনে হাজির করা। ঘটনার আবরণ ছাড়িয়ে নিয়ে এর অস্থিমজ্জা পাঠক-দর্শকের সামনে হাজির করেন। স্যমবেনের চলচ্চিত্রগুলোও এই সত্যই উদঘাটনের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর *দ্য ওয়াগোনার* চলচ্চিত্রটি দাকার শহরের একজন গাড়ী

চালকের হতাশার চিত্র অংকন করে। *নিয়ায়ে*-তে তুলে ধরেছেন ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার তিক্ত অনুভূতির কথা, *তাউ*- এ অংকন করেছেন বুর্জোয়া শাসিত সেনেগালের তীব্র বেকারত্বের সমস্যার কথা। *সেদ্দো* তো আত্মসমালোচনার সাহসী বয়ান। তাঁর চলচ্চিত্রের বেশ কয়েকটি দৃশ্য বার বার সেন্সর বোর্ডের কাঁচির নীচে পড়লেও স্যমবেন একজন সত্যিকারের শিল্পীর কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়ান নি। সমঝোতাও করেন নি তাঁর বিরুদ্ধ শক্তির সাথে।

যাই হোক, স্যমবেন একজন সত্যাদর্শী ও সত্যভাষী আফ্রিকার কণ্ঠস্বর। তার উপন্যাস, গল্প, চলচ্চিত্র বিশ্বের কাছে সেনেগাল তথা আফ্রিকার আত্মসমালোচনার বয়ান হিসেবে উপস্থাপন করে। শুধু প্রাক্তন ঔপনিবেশিকদের দোষারোপ করা বর্তমান কোনো সমস্যার সমাধান নয়। বরং নিজেদের ছিদ্র অন্বেষণ করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যেই আফ্রিকার অগ্রগতির মন্ত্র নিহীত আছে। এই বার্তাই ধ্বনিত হয়েছে স্যমবেন উসমানের সব সৃষ্টিকর্মে। এই মর্মার্থ ধ্বনিত করার প্রেরণা এসেছে স্যমবেনের ইতিহাস ও বাস্তবা-সংশ্লিষ্টতা থেকে। তাঁর সব চলচ্চিত্রের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয় ইতিহাসের জারক রস ও বাস্তবতার উষ্ণ শোনিত। চলচ্চিত্রের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই উপমহাদেশের সত্যজিৎ রায়ের মতই তিনি প্রান্তিক, অপেশাদার মানুষদেরকে অভিনয়ে যুক্ত করেছেন। ফলে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে চরিত্রের স্বত:স্ফুর্ত সংশ্লিষ্টতা কাহিনীর উপস্থাপনাকে করেছে বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র বিশ্বের যেকোন প্রান্তের দর্শকের কাছে আফ্রিকী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পরিবর্তন ও নানা অভিঘাতে আফ্রিকার প্রতিক্রিয়া ও অবস্থানের স্বচ্ছ প্রতিফলন স্বরূপ।

তথ্যসূত্র:

Gikandi,Achebe, Chinua. *Trouble with Nigeria*. Enugu: Michigan State University Press, 2005. Print.

Gikandi, Simon(ed). *Encyclopedia of African Literature,* London and New York: Rutledge, 2005, Print.

Gadjigo, Samba. *Ousman Sembene: The Making of a Millitant Artist*. Bloomington: Indiana University Press, 2010. Print.